বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০৩ চৈত্র ১৪২৯
১৭ মার্চ ২০২৩

বাণী

১৭ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়- অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা 'বাংলা'র উপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২ এর ভাষা আন্দোলন', '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন', '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন', '৬৬ এর ৬-দফা', '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান', ৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। কিন্তু হায়েনার দল বুঝতে পারেনি জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে লোকান্তরের বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিশালী।

জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না"। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। আজ সকল আশঙ্কা ও নেতিবাচক ভবিষ্যৎ বাণী ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙ্গর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলায়'।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

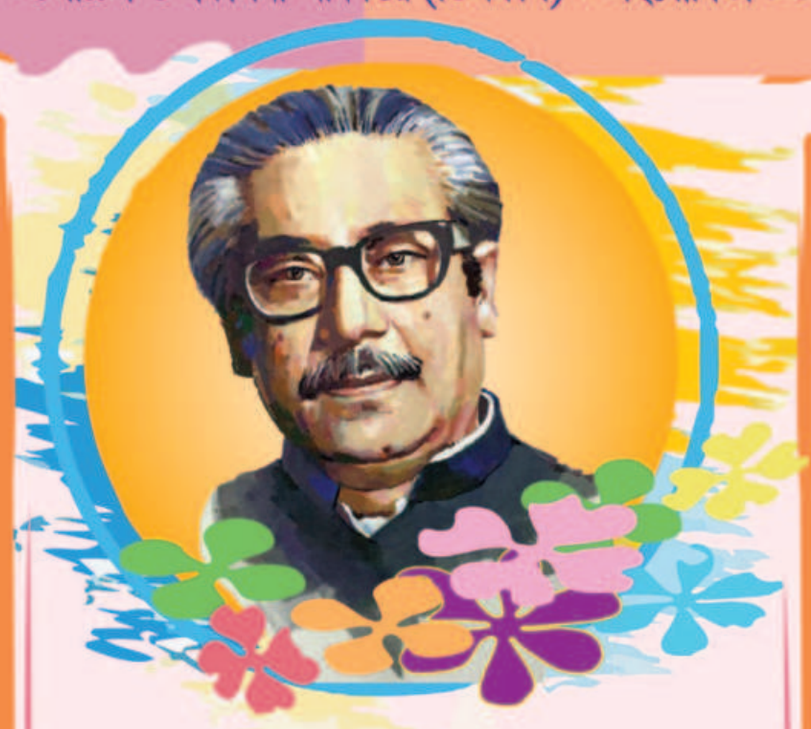

১৭ মার্চ

জাতীয় শিশু দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম হয়েছে বলেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে

মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু

পরাধীনতার নিকষ অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি জাতির ভাগ্যাকাশে মুক্তির প্রভাকর রূপে জন্ম নেওয়া 'খোকা' নামের সেই শিশুটি শিক্ষাদীক্ষা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, মহত্তম জীবনবোধ, সততা, সাহস, দক্ষতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে হয়ে ওঠেন বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির পিতা। সেই অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী আজ। বাঙালি জাতির এই মহান নেতা ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়ার চিরায়ত গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি শিশুকাল থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রামের মাটি আর মানুষ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার-মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা পীড়ন দেখে চরমভাবে ব্যথিত হতেন গ্রামের হিন্দু, মুসলমানদের সম্মিলিত সম্প্রীতির সামাজিক আবহে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িক চেতনার। কিশোর বয়সেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মতো গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। এরপর থেকে শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রামী জীবনের অভিযাত্রা। তিনি সারাজীবন এদেশের মাটি ও মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য জীবনের ১৪টি বছর পাকিস্তানি কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে বন্দি থেকেছেন, দুই বার ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু আত্মমর্যাদা ও বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের প্রশ্নে কখনও মাথা নত করেননি, পরাজয় মানেননি। দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু তার সহকর্মীদের নিয়ে ১৯৪৮ সালের চার জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে কারাগারে বসেই বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন এবং যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে '৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান জনসমুদ্রে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ভূষিত হন "বঙ্গবন্ধু" ও পরবর্তীতে "জাতির পিতা" খেতাবে।

বঙ্গবন্ধুর সাহসী, দৃঢ়চেতা, আপোশহীন নেতৃত্ব ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে ওঠে শতবছরের নির্যাতিত-নিপীড়িত পরাধীন বাঙালি জাতি। মুক্তির অদম্য স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন।

অতঃপর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪২৯
১৭ মার্চ ২০২৩

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় শিশু দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য- 'স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তকরা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত আন্দোলনে কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মমতা ছিল অপরিসীম। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ; শিশুরাই তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। শিশুদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে- এই ভাবনা থেকেই জাতিসংঘ শিশুসনদের ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে তিনি শিশু আইন প্রণয়ন করেন। শিশু শিক্ষার বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন। শিশুরা যেন সৃজনশীল-মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে- তিনি সব সময় সেটাই চাইতেন। এজন্য তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে ১৭ মার্চকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে ।

আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী 'জাতীয় শিশুনীতি' প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এ দেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের সরকারের মুখ্য লক্ষ্য। আমাদের শিশুরাই হবে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের সারথি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে দল-মত নির্বিশেষে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমি আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। আসুন, আমরা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি এবং সকলে মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি ।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের অপর নাম শেখ মুজিবুর রহমান

প্রফেসর আবদুল মান্নান

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজ ১০৪তম জন্মদিন। স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর যদি মৃত্যু হতো হয়তো প্রতিবছর আনন্দঘন পরিবেশে পরিবারে আর জাতীয়ভাবে দিনটি পালিত হতো। কিন্তু ঘাতকরা জাতির পিতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করার পর দিনটিকে সেভাবে আর পালন করা হয় না। দিনটিকে এখন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। সম্ভবত পরিবারে তাঁর সবচেয়ে আদরের ছিল তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল যাকে ১৫ আগস্ট ঘাতকরা নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল। শেখ রাসেলের মতো ১০ বছরের একজন শিশুকে কোনো মানুষ হত্যা করতে পারে, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। তবে ১৫ আগস্টের ঘাতকরা যত না মানুষ ছিলো তার চেয়ে বেশি ছিলো পিশাচ। পরবর্তীকালে যারা এই ঘাতকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল তাঁরাও তাদের সমগোত্রীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯৭০ সালের সেই অগ্নিঝরা দিনে ১৭ মার্চ একজন বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আজ তাঁর জন্মদিন । উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তিনি তো কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেন না। পরবর্তিকালে সেই শেখ মুজিবের নামই হয়ে গেলো বাংলাদেশের অপর নাম। আজকের এই দিনে জাতির পিতাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। চিরদিন তিনি বেঁচে থাকুন বাঙালির হৃদয়ে, অমর হয়ে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর সমবয়সি যদি দুই-একজন এখনো বেঁচে থাকেন, তাঁদের কাছে বঙ্গবন্ধু এখনো মজিবর। অবশ্য মা-বাবার আদুরে নাম খোকা। হয়তো নিকটাত্মীয়রা শেখ মুজিবকে সেই নামেই ডাকতেন। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তেই লিখেছেন, তিনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই আমলে বাঙালি মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব ছিল হাতে গোনা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন আজীবন প্রতিবাদী। স্কুলে পড়ার সময়ই শেখ মুজিব মনে করতেন 'ইংরেজদের এ দেশে থাকার অধিকার নাই।' তখন সারা ভারতবর্ষে স্বদেশি আন্দোলন চলছে। মুজিব সেই আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর চরিত্র যে কিছুটা একগুঁয়ে স্বভাবের ছিল তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। পিছন ফিরে তাকালে বলতে হয়, তাঁর একগুঁয়ে স্বভাবই তাঁকে পূর্ব বাংলার স্বার্থে আপোশহীন নেতা হতে সহায়তা করেছিল। শেখ মুজিবের প্রতিবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ তাঁর গোপালগঞ্জে বাল্য ও কিশোর জীবনেও দেখা গিয়েছিল।

১৯৪১ সালে অসুস্থ শরীর নিয়ে শেখ মুজিব ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পরীক্ষা প্রত্যাশা অনুযায়ী না হওয়া সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছিলেন। পরীক্ষার পরপরই কিশোর মুজিব কলকাতায় যান। তখন পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। চল্লিশের দশকে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলনের সঙ্গে তরুণ শেখ মুজিব নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। যোগ দেন মুসলিম লীগ আর মুসলিম ছাত্রলীগে। এ সময় মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর আবুল হাশিমের সান্নিধ্যে আসেন এবং সংগঠন সৃষ্টির তালিম নেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবুল হাশিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন শেখ মুজিব একজন ভালো কর্মী ও সংগঠক ছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন শেখ মুজিবের মতো সংগঠক তিনি কখনো দেখেননি।

কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমানে মওলানা আযাদ কলেজ) ছাত্র থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের বড়ো পরিবর্তনগুলো শুরু হয়। এ সময় তিনি অবিভক্ত বাংলার বড়ো মাপের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নেতাজি সুভাষ বসুর ডাকে তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগকে (মুসলিম ছাত্রলীগ) তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন এবং এর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি দিতেন।

১৯৪৩ সালে বাংলার এক কঠিন সময়ে শেখ মুজিব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য হন। এ সময় সারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময় মুজিব তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা খুলে ক্ষুধার্তদের জন্য খাদ্য যোগানের চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর একটি ব্যতিক্রমী গুণ ছিল, তিনি সময় পেলেই উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রতিবাদী মানুষের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করতেন। সম্ভবত বঙ্গবন্ধুর মতো পড়ুয়া রাজনীতিবিদ তখনো তেমন একটা ছিল না, এখনতো একেবারেই নেই।

অনেক জল্পনা-কল্পনা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা, আসাম ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, 'পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল।' এই ষড়যন্ত্র ছিল মূলত বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র। কলকাতা পর্ব চুকিয়ে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুজিবও ঢাকায় চলে এলেন এবং মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেন। দেশভাগের পূর্ব থেকেই মুসলিম লীগে ভাঙন দেখা দেয়। এক ভাগের নেতৃত্ব দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আর অন্য ভাগের নেতৃত্বে থাকেন খাজা নাজিমুদ্দীন। শেখ মুজিব আজীবন সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত ছিলেন এবং তাঁরই অনুসারী থেকে যান। অবিভক্ত বাংলায় যেটি 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' ছিল, তার নাম বদলে 'নিখিল পাকিস্তান ছাত্রলীগ' করা হয়। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। এরই মধ্যে অনেকের ছাত্রত্ব চলে গিয়েছিল। শেখ মুজিব বললেন, ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রলীগ গঠন করতে হবে, তবে অছাত্রদের নিয়ে নয়। শুরু হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য জেলার ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্থির করা হয় একটি ছাত্রসংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার নাম হবে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। গঠিত হলো পাকিস্তানের প্রথম ছাত্রসংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ', পরবর্তী সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। প্রথম আহ্বায়ক করা হয় নইমউদ্দিন আহমেদকে। সভায় অনেকে তরুণ শেখ মুজিবকে দলের প্রথম আহ্বায়ক হতে অনুরোধ করেন কিন্তু তা তিনি নাকচ করে দিয়ে বলেন, তিনি এখন আর ছাত্র নন, সুতরাং ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে সব সময় ছাত্রদের হাতেই থাকা উচিৎ। ছাত্রলীগের যাত্রাটা সূচনা করেছিল ছাত্ররাজনীতির এক সোনালি যুগ। ছাত্রলীগের সৃষ্টি ও তাকে গড়ে তোলার একক কৃতিত্ব শেখ মুজিবের। নেতৃত্বের গতিশীলতার কারণে ছাত্রলীগ দ্রুত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদ বৈঠকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা এই মত প্রকাশ করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু। অথচ সেই সময় পাকিস্তানের বেশিরভাগ (৫৬ শতাংশ) মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। উর্দুতে কথা বলতেন মাত্র ৬ ভাগ মানুষ যাদের বেশিরভাগই এসেছিলেন মোহাজের হয়ে ভারত থেকে। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রতিটি সভা ও মিছিলে শেখ মুজিব ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতাদের অংশগ্রহণ ছিল অবধারিত। একপর্যায়ে শেখ মুজিবসহ অনেককে জেলে নেওয়া হলো। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসেন। ২১ মার্চ রমনা রেসকোর্স মাঠে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় ইংরেজিতে বলেন, 'Urdu and Urdu shall be the only state language of Pakistan'। শেখ মুজিব সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অন্য ছাত্রদের সঙ্গে শ্লোগান তোলেন, 'মানি না'। তিনদিন পর ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তনে জিন্নাহ সাহেব আবার একই কথা বললেন 'My dear students for the sake of Islam I have decided that Urdu alone would be the state language of Pakistan'। বাস্তবে ইসলামের সঙ্গে জিন্নাহর ন্যূনতম সম্পর্ক ছিল না। আবারও তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। জিন্নাহ চলে যাওয়ার কয়েক দিন পর ফজলুল হক হলে একটি ছাত্রসভা হয়। সেই সভায় একজন ছাত্র জিন্নাহর বক্তব্যের সমর্থনে কথা বলেন। সভায় উপস্থিত শেখ মুজিব সেই ছাত্রের বক্তব্যের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন